বাংলা গল্প সাহিত্যে ভূতকথা : পরম্পরা ও পরিবর্তমানতা

ঋক্‌সুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভূত' শব্দটাই ভীষণ প্রয়োজনীয়। ভালো-খারাপ, আচমকা কোনো বিষয়ে কারো শখ—সবকিছুর জন্য উপযুক্ত শূন্যস্থান পূরণ করার যথার্থ শব্দ হল—ভূত। বাঙালি জীবনে ভূতের জয়জয়কার। একেবারে ছোটো ছেলেকে ভয় দেখিয়ে কাজ সেরে নেওয়া মা ভূতের ভয় দেখিয়ে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আটকে রাখেন আবার গ্রীষ্মের ছুটিতে মামারবাড়িতে দুপুরবেলা আচমকা দাদু যে ঘরে শেষ কটা দিন থাকতেন সেখানে কিছু দেখে ফেলার ভয় থেকে সারাদিন কমপিউটার গেমস্-এর 'ভূত' মাথায় নিয়ে চলা। ভূত তাই আমাদের যাপনের সঙ্গেই মিশে আছে। ভূতচতুর্দশী থেকে ভূতে ভোট দিয়ে যাওয়া—হালফিলের পত্রিকাগুলোয় 'ভূত' নিয়ে পরপর সংখ্যা, হলিউড-বলিউডের পাশাপাশি বাংলা ছবিতেও ভূতেদের রমরমা। বিদেশি ভূতেদের তো ধারাবাহিক একটা ইতিহাস ছিলই, ছিল স্পুক, গবলিন, ওয়ারউলফ্, পলটারজাইট, ভ্যাম্পায়ার, ড্রাকুলা, আফিদ, মারিদ, জিন, জম্বি—হ্যালোইন ফেস্টিভেল। বাঙালি জীবনে ভূতের অনুপ্রবেশ কীভাবে ঘটল? সাহিত্য, সমাজ আর লোকবিশ্বাসে ভূতের ধারণা, ভূতের চরিত্র আর ভূতের বলা কথা কীভাবে সময় আর আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের নিরিখে বদলে গেল তার খোঁজ এক দীর্ঘ পথপরিক্রমা। আমরা সেই অতীত থেকে বর্তমানে পৌঁছাব—বর্তমানের প্রেক্ষাপট থেকেই।

> সেক্টর ফাইভ থেকে গাড়ি নিয়ে রোজ রাত্রে ফেরে অপ্রতিম। ফাঁকা রাস্তা, নিজেই গাড়ি চালানোর ফাঁকে মাঝেমাঝেই চোখ চলে যায় লুকিং গ্লাসে। সবসময়ই মনে হয় পিছনে কেউ বসে আছে।
>
> অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে আদৃতা। কিছুতেই দরজার পিছন দিকে মুখ করে বসতে পারে না—সবসময় মনে হয় পিছন দিক থেকে কেউ উঁকি মেরে ওকে দেখছে।

'কনজুগারিং' সাম্প্রতিক একটি বিদেশি ছবি। দেখার পর থেকে ছবির নিরিখে রাত্রি ৩টে ৭ মিনিটে অতিপ্রাকৃত আবহ তৈরি হয় বলে মনে করে ঘুম ভেঙে মাকে খোঁজে ক্লাস সেভেনের অভিজিৎ।

না, এগুলো কোনো গল্প লেখার সঙ্কেত নয়। মনোবিদদের চেম্বারে উঠে আসা সমাজের বিভিন্ন স্তরের সমস্যা। মনোবিদরা এই সমস্যার সমাধান করেন ফ্রয়েড, এডলার ইয়ুং, লাকা, সুল্লিভানদের কথা বলে আর সাহিত্য বা অন্য যে-কোনো শিল্প মাধ্যম খুঁজবে 'ভূত' হয়ে ওঠার গল্পটা। এবার আমরা বিশ্ববন্দিত দুজন লেখকের দুটি গল্পের অংশের দিকে তাকিয়ে চলে যাব ভূতেদের সাহিত্য, সমাজ আর ইতিহাস ভূগোলের পথপরিক্রমায়।

সূর্য যখন গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল, তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালার একটি ছায়া যবনিকা পড়িয়া গেল—ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়ে আসিব মনে করিয়া উঠিব-উঠিব করিতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, কেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথ : 'ক্ষুধিত পাষাণ'।

A Sudden Shiver ran through me, not a cold Shiver but a strange shiver of agony hastened my steps, uneasy at being alone in the forest, afraid stupidly and without reason, of the profound solitude. Suddenly it seemed to me as if I were being followed, as if somebody is walking at my heels, close, quite close to me, near enough to touch me.

I turned round suddenly but I was alone.

Maupassant : 'The Horla'.

মোপাসাঁ আর রবীন্দ্রনাথের ভিন্ন সময়, ভিন্ন স্থান আর ভিন্ন গল্প হওয়ার পরেও অভিজ্ঞতা একই। পিছন ফিরে কিছু নেই কিন্তু কি যেন ছিল!

এ জীবনে প্রত্যক্ষ ভূত থাকা বা না-থাকা নিয়ে অন্তহীন তর্ক চলতে থাকলেও ভৌতিকতা প্রবলভাবে আছে। সাহিত্যে সেই ভৌতিকতাই ভূতের থেকেও অনেক বেশি আলোচিত। ভূতের গল্পের অন্যতম লক্ষণই হল শঙ্কা, উৎকণ্ঠা, আর সর্বদা কিছু একটা ঘটার সম্ভবনা। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'অন্য ভুবন' নামে ভৌতিক গল্পের সঙ্কলনে বলেছেন—'ভূতের গল্প, রহস্যময় গল্পের বারবারই হচ্ছে dim, unseen forces আর Shapelese terror নিয়ে। শুধু ছায়া নয়, ছায়ারও ছায়া। ....এখানে সময়ের সীমা ও দেহ ব্যবধান অনায়াসে লঙ্ঘিত হয়। এখানে শব্দ মৃদু, স্বর অনুচ্চারিত,

বায়ুস্রোত এবং অশরীরী স্পর্শ লঘু ও হিমশীতল। সম্পর্ণভাবে অবচেতনের রাজত্ব। সূক্ষ্ম মনের যোগাযোগ, কল্পনা ও বাস্তবের মিলন, সম্ভব ও অসম্ভবের সমন্বয়, উৎস্বপ্ন, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, আগামী আভাস এখানে অবলীলায় কাজ করে।'[১]

সভ্যতার বাহ্যিক অগ্রগতি যে ঘটেছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রকৃতির কাছে পরাধীন মানুষ এখন অন্তত বিপর্যয়ের পূর্বাভাস পায়—অন্ধকার দূর করে মানুষ ভয়কে অনেকটাই দূরে সরিয়ে রাখতে পারে—কিন্তু মনে মনে এখনো গা ছমছমে পরিবেশ আর ভূতের গল্পের প্রতি মানুষের আগ্রহ প্রবল। ভূতের গল্প, ভূতের চলচ্চিত্র সে কারণেই মানুষের কাছে এত জনপ্রিয়। এই ক্রমবিবর্তনের ধারাটার দিকে ফিরে তাকালে আমরা কিন্তু প্রথমেই 'ভূত'কে খুঁজে পাই না আজকের মতো করে।

'ভূত' শব্দটির যে-কোনো অভিধানে অর্থ খুঁজতে গেলেই আমরা পাই 'অতীত'। 'যা ছিল'। পাশাপাশি আবার ভূত অর্থে যা বর্তমান। বিশেষণ অর্থে 'ভূত' শব্দে অতীত বোঝায়। ভূ + ত [র্তৃ]—ঘটে গেছে এমন কিছু বোঝায়। আর বিশেষ্য শব্দ 'ভূত' সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তিত্ব বা অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়। মৃত্যুর পর মানুষ বা অন্য কোনো জীব যে অবয়ব ধারণ করে তাকে বোঝায়। কিন্তু 'ভূত' আবার প্রবলভাবে বর্তমানও। কারণ 'পঞ্চ-ভূত' ধারণাটাই এসেছে এই চিরাচরিত অবস্থানের অনুষঙ্গে। ভৌত-বিজ্ঞান—সেও তো যা আছে তাকে নিয়েই। তবে গল্পকথা আর ট্র্যাডিশনাল বিশ্বাস অনুসারে ভূত হল মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থান। প্রচলিত মৌখিক গল্পে তো বটেই সাহিত্যেও আমরা ভূতের প্রসঙ্গ বহুদিন ধরেই চলে আসতে দেখেছি। ভূত চরিত্র ছাড়াও সাহিত্যে ভৌতিক ভাবনার নিদর্শন হিব্রু বাইবেলের সময় থেকেই আমরা দেখতে পাই। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের প্রতি মানুষের বিশ্বাস আড়াই হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে। 'প্যাপিরাস স্পেল', 'টোম্ব পেইন্টিং'-এর মধ্যে আমরা তা দেখতে পাই। মহাকাব্যদ্বয় 'ইলিয়াড' 'ওডিসি'তে হোমার ভূতের অনুষঙ্গ এনেছেন। খ্রিস্টজন্মের পাঁচশো বছর আগে গ্রিসে 'ওরেস্টেডো' নাটকে ভূতের শিল্পমাধ্যমে প্রথম প্রকাশ। এখন কোনোভাবেই পড়ার সুযোগ না থাকলেও ইউরোপীয় রেনেসাঁসের আমলে ঘনঘন পুনর্মুদ্রিত একটি বইয়ের নাম জানা যায় 'অফ ঘোস্টস অ্যান্ড স্পিরিটিস ওয়াকিং বাই নাইট'। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে সংস্কৃত বা বাংলাতেও আমরা রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতিকে পেয়েছি। সংস্কৃত সাহিত্যে 'বিক্রম-বেতাল' চরিত্রদ্বয়ের মধ্যে বেতালকে ভূতরূপেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে দেখেছি। রাক্ষস, প্রেত, পিশাচের ধরন তাদের সাহিত্য নিয়ে আলাদা আলোচনা না করে আমরা যদি শুধুমাত্র ভূতের সাহিত্যের ওপরই চোখ রাখি তাহলে দেখব রাক্ষস বা পিশাচের অতীত জীবনটা গুরুত্বহীন, কিন্তু ভূতের একটা অতীত মনুষ্যজীবন গল্পকেই আরো উপভোগ্য করে

তোলে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর লেখায় 'প্রেতের হাট' বাংলায় মৌখিক পরম্পরা ছাড়া ভূতের কথা বা প্রেতের কথা বলার অন্যতম নির্দশন—

'মাংস বেচে কাচা রান্ধা/কেহ কিনে দিআ বান্ধা/নরমাথা ঝুননা নারিকল।
পিশাচ-পিশাচীগুলো/গজদন্তে বেচে মুলা/ঝুড়ি-মুলে নখ-পানিফল।'

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থেও আমরা 'ভূতঃগম্' কথাটি পেয়েছি। তবে ভূতেরা শিবের অনুচর রূপে নৃত্যগীত এবং তাণ্ডব পরিবেশন করার ফলে তা হাসির আলম্বনবিভাব রূপেই আস্বাদিত হয়েছে। বরং লৌকিক পরম্পরায় চলে আসা ভূতেদের গল্পের মধ্যে 'দ্য ঘোস্ট হু ওয়াজ অ্যাফ্রেড অব বিয়িং ব্যাগড' (লালবিহারী দে : 'ফোক টেলস অব বেঙ্গল') কিছুটা ভয়ের উদ্রেক দেখতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে ছোটো হরিদাসের অপঘাতে মৃত্যুর পর সবাই মনে করেছিল সে 'ব্রহ্মরাক্ষস' হয়েছে। পরবর্তীতে কৃষ্ণদাস জানিয়েছেন ছোটো হরিদাস মৃত্যুর পর গন্ধর্ব হয়েছিল। গন্ধর্বকেও আমরা (ভূত) অমানব অস্তিত্ব বলেই জানি যার গানের গলা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। বৃন্দাবনদাসের 'চৈতন্যভাগবত'-এর মধ্যখণ্ডে ২৫ অধ্যায়ে চৈতন্যদেব শ্রীবাসের বাড়িতে এসে এক মৃত শিশুর সঙ্গে কথা বলেন।

সুকুমার সেন মহাশয় ভূতকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন—'ভূত তদ্‌ভব অর্থে হল যা ফুরিয়ে গেছে কিন্তু যার আদল লুপ্ত হয়নি। ...ভৌতিক ভীতির মূল শুধু প্রত্যক্ষের অগোচর বাস্তবকায়াহীন সত্তার অস্তিত্ব কল্পনায় নয়। প্রাণের নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মৌলিক অসহায়তা ভীতির মধ্যেই এর বীজ রয়েছে। ...নিঃসহায় একাকীত্বের অহেতুক ভীতি এই-ই ভূতের ভয় প্রভৃতি অনির্দেশ্য আতঙ্কের বীজ।'[২]

মৃত্যু আর তার পরবর্তী জীবন নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। বহুযুগ আগেই মিশরের পিরামিড আর মমি মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের বিশ্বাসে নির্মিত হয়েছিল। মৃত্যু অত্যন্ত স্বাভাবিক একটি জৈবিক ঘটনা আর মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অস্তিত্বের ধারণা এই স্বাভাবিক ঘটনাকেই করে তোলে রহস্যঘন। ভয় মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। যেখানে যুক্তি-বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পৌঁছাতে পারে না সেখানেই থাকে অজানাকে জানার অদম্য কৌতূহল। না জানা জগৎ সম্পর্কেই এডওয়ার্ড চার্লস হুইটমোর বলেছেন—

> It is in the very uncertainty of the fear that its horror lies, in the sense of some indefinable presence and in the utter inability to judge of the limits of the power which this presence can exercise probably for baleful ends. The feeling is deeply rooted in the primitive consciousness that these forces of the other world are

of doubtful friendlyness to man, they surely have the capacity, almost certainly the desire to harm.....The supernatural terror may accordingly be defined as the dread of some potentially malevolent power of incalculable capacity to work evil.[৩]

অন্ধকার ও মৃত্যু-সংক্রান্ত ভয় একসঙ্গে মানবমনে ভূত বা অপসত্তার ভয়ের জন্ম দেয়। স্বাভাবিকভাবে সেখানে কাজ করে তার কল্পনাও। 'অন্যভুবন'-এ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন—'মৃত্যুচিন্তা হল আত্মপ্রীতির সেরা নমুনা। এই দেহকে এবং তাকে কেন্দ্র করে জীবনকে ভালোবাসা—আর জীবনান্তে অজানা জগৎ এবং সে সম্বন্ধে বিভীষিকা, এই প্রীতি ও ভয় দুটোই আভিমানিক। ...অতএব ভূতের ভয় মানেই মৃত্যুভয়, অজানার বিভীষিকা এবং সেটা খুবই স্বাভাবিক।'[৪]

আর মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে অজস্র ধর্মীয় বা অতিপ্রাকৃত সাহিত্য রচিত হলেও সার্থকভাবে সর্বসাধারণের কাছে ভূতের গল্পের মতো জনপ্রিয় আর কিছু হয়নি। সাহিত্যে তো আমরা সবরকম ভূতের পরিচয় পাই না—স্থান, কাল, সময়, প্রতিবেশভেদে ভূতেরাও একেকরকম নাম নেয়। বাংলার জল-হাওয়ায় 'মেছো ভূত' দেখা গেলেও নদীমাতৃক নয় এরকম কোনো প্রদেশে এবং অস্তিত্বই নেই। বাংলার ক্ষেত্রে ভূতেদের গড়ে ওঠার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। বাংলা ভূতের গল্পের ক্ষেত্রেও আমরা সমাজ-রাজনৈতিক এবং বাঙালি জীবনে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনাকে গল্পে ধরা পড়তে দেখি। এর সঙ্গেই রয়েছে নানানরকম ভূত। প্রেত থেকে প্রেতিনী হয়ে পেত্নী। সধবা মহিলারা মারা গেলে শাঁখা অর্থাৎ শঙ্খচূর্ণি থেকে শাঁকচুন্নি। ব্রাহ্মণ বিবাহের পূর্বে গত হলে ব্রহ্মদৈত্য—এছাড়াও মামদো, একানড়ে, স্কন্ধকাটা, হাঁড়া ভূত, বাঁড়ুল ভূত—নানারকমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে ওঠা উচ্চ-নীচ-ধর্মভেদে আলাদা ভূত। তাদেরকে নিয়ে অজস্র ভূতের গল্প—আসলে হয়তো মানুষের না-বলতে পারা কথাগুলোই ভূতের মুখ দিয়ে বলিয়ে নেওয়া গল্প।

সময়টা উনিশ শতক। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বলেছেন—'কর্নেল অলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কি আসিয়া বোম্বাই শহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন।'[৫]

থিয়সফিক্যাল সোসাইটির তৎকালীন উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'-র দ্বিতীয় খণ্ডে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—'To Promote the study of the estoric philosophies of the East.'[৬] এই থিয়সফিক্যাল সোসাইটির মুখপত্ররূপে প্রকাশিত হত 'থিয়সফিস্ট' নামক পত্রিকা।

খ্রিস্টাব্দে চন্দননগরের পাদ্রি ফাদার গেঁরে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত করেছিলেন। এখানে বেশ কয়েকটি মজার ভূতের গল্প দেখতে পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যের 'Satan'-এর প্রসঙ্গ থেকেই গল্পগুলিতে ভূতের নির্মাণ। রাখাল বালককে ভূত অর্থের লোভ দেখায় এবং ঈশ্বর আরাধনা করতে বারণ করে। কিন্তু বালকটি জোর করে ঈশ্বর সাধনা করে এবং ভূতের পরাজয় ঘটে। আর-একটি গল্পে ভূত ছদ্মবেশে গির্জায় প্রবেশ করে। জানতে পারার পর গির্জার প্রতিটি দরজায় ক্রশচিহ্ন এঁকে ভূতকে বন্দি করার চেষ্টা করা হলে একটি লম্বা দড়ি বেয়ে পালিয়ে যায়। উইলিয়াম কেরি সঙ্কলিত 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থটিতে একটি অতিপ্রাকৃত গল্পের সন্ধান পাওয়া গেলেও তা ভূতের গল্প হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত 'আখ্যানমঞ্জরী' (১৮৬৩-৮৮) নীতিমূলক গল্পগ্রন্থ। সেখানে 'অকুতোভয়তা' নামে একটি গল্পে ভৌতিক উপদ্রবের প্রসঙ্গ আছে। যদিও গল্পটিতে ভূত অনুপস্থিত কিন্তু বর্ণনকৌশলে আর প্রতিবেশ সৃষ্টি গল্পটিকে অন্যমাত্রায় পৌঁছে দেয়। বিদ্যাসাগর বিজ্ঞানমনস্ক এবং যুক্তিবাদী ছিলেন। অলৌকিক বা ভূত প্রত্যক্ষভাবে না থেকেও আমাদের ভয় পাওয়ার সাধারণ সূত্রটিই এই গল্পে প্রতিফলিত।

বাংলা সাহিত্যে আরও একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অতিপ্রাকৃত বা প্রেততত্ত্ব বিষয়ে লিখেছেন প্যারীচাঁদ মিত্র। শুধুমাত্র রচনা নয় দেশ বিদেশের বিভিন্ন 'স্পিরিচুয়ালিস্ট'দের সভাসমিতিতেও তিনি যেতেন। 'ব্রিটিশ ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব স্পিরিচুয়ালিস্টস' প্রতিষ্ঠানের 'অনারারি মেম্বার' হয়েছিলেন তিনি। প্রেততত্ত্ব-বিষয়ক প্যারীচাঁদের অনেক রচনা লন্ডনের 'স্পিরিচুয়ালিস্ট' এবং আমেরিকার 'ব্যানার অফ লাইট' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্যারীচাঁদ অতিপ্রাকৃত, দৈবিক, প্রেততত্ত্ব-সংক্রান্ত চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫) 'অভেদী' (১৮৭১) আর 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) গ্রন্থে।

'যৎকিঞ্চিৎ'-এ বিদেশি ছায়ায় একটি ভৌতিক কাহিনি দেখতে পাওয়া যায়। যুদ্ধে মৃত এক সৈনিক তার স্ত্রীর কাছে পুনরায় আবির্ভূত হন। এই কাহিনিটি অনেকেই বিদেশি গল্পের বঙ্গানুবাদ বলে মনে করেন। 'অভেদী'তেও মূল যে কাহিনি দেখতে পাওয়া যায় সেখানে মৃতব্যক্তির আত্মার প্রিয়জনের কাছে আবির্ভাবের কথা রয়েছে। 'আধ্যাত্মিকা' উপন্যাসে বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণ কন্যার অলৌকিক শক্তির কথা বলা রয়েছে যে মৃত্যুর পর পুনরায় মাকে দেখতে পেয়েছিল। প্যারীচাঁদের রচনায় ভূতের থেকেও অনেক বেশি ছিল অতিপ্রাকৃত আবহ আর আধ্যাত্মশক্তির বর্ণনা। তবে এই আধ্যাত্মঘন অতিপ্রাকৃত আবহের বর্ণনা পরবর্তীকালে আমরা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীদের রচনাতেও দেখতে পাই।

'থিয়সফিক্যাল সোসাইটি'-র সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বাংলার অন্যতম সাহিত্য ব্যক্তিত্ব প্যাঁরীচাঁদ মিত্র। থিয়সফিক্যাল সোসাইটির সদস্যদের কলকাতায় আগমনকালে ঠাকুরবাড়ির অনেকেও তাদের সঙ্গে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থের 'শিক্ষারম্ভ' নামক অধ্যায়ে তাঁর গুরুজনদের প্ল্যানচেট চর্চার কথা বলেছেন। থিয়সফিক্যাল চর্চার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক জগৎ সম্পর্কে কৌতূহলের উন্মেষ ঘটেছিল স্বাভাবিকভাবেই। সুকুমার সেন বলেছেন— 'অন্য কোনো কোনো কুসংস্কার-এর মতো ভূতের কুসংস্কারকে মনে ঠাঁই দিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর (ইংরেজি) শিক্ষিত বাঙালী লজ্জাবোধ করত। এ লজ্জার বাঁধে আঘাত হানলেন কর্ণেল ওলকট ও মাদাম ব্লাভাটস্কি। ....থিয়সফিতে আর কিছু না করুক গোড়াতেই দৈবশক্তিতে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে গিয়ে ভূতের ব্যাপারে শিক্ষিত বাঙালীর অবিশ্বাস শিথিল করে দিয়েছিল। ....তার দ্বারা সাহিত্যে ভূতের গল্পের ভূমি রচিত হল।'[৭]

এর পাশাপাশি নবজাগরণের যে ঢেউ বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে—১৮৩১ সালে রামমোহনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মসমাজ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, পত্রপত্রিকার বিস্তার একধাক্কায় বাঙালির 'Frontier of Knowledge'-কে অনেকটা এগিয়ে দেয়। কোনো বিষয়ে জানা-বোঝা একান্তভাবেই নিজের অস্তিত্ব ও অবস্থানের সঙ্গে যুক্ত। জানার সঙ্গে সঙ্গেই 'বাঁচাও' সম্পর্কিত। বেঁচে থাকা কোথাও গিয়ে জানাকেই নিশ্চিত করে। এই সময়েই সাধারণ দার্শনিক অবস্থানরূপে নব্যভারত, আর্যসমাজ, বাঙালি বিদ্বৎসমাজ সকলে একত্রিত হয় এবং অনুভব করে যুক্তির বাইরে কিছু নেই। ঈশ্বর = 0 (শূন্য) এবং যুক্তির বাইরে কিছু না থাকা—মানুষের না জানার প্রতি কৌতূহল, না দেখা, না-জানা জগৎ সম্পর্কে মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ। আর সাহিত্যে সেই রসাস্বাদনেরই খোঁজ। না জানা সত্তা যখন উৎসাহী হয়ে ওঠে তখনই প্রয়োজন হয় অলৌকিক ঘটনার, অতিপ্রাকৃত অভিজ্ঞতার। আর খাঁটি অলৌকিক ঘটনার অভিজ্ঞতা শোনার থেকে প্লটবিন্যাসে সুসজ্জিত ভৌতিক গল্প রসবিচারে অনেক বেশি মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষায় সঙ্কলিত সম্ভবত প্রাচীনতম ভূতের গল্প কোনো বাঙালির লেখা নয়। পর্তুগিজ পাদ্রি ম্যানুয়েল—দা আস সুম্পমাও (Fr. Manoel Da Assumpcam) রচিত বা সঙ্কলিত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (রচনাকাল ১৭৩৫, প্রকাশ কাল ১৭৪৩)। রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী—খ্রিস্টধর্মের প্রচার ও প্রসার ছিল গ্রন্থটির উদ্দেশ্য। গ্রন্থটি ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন-এ রোমান হরফে মুদ্রিত হয় আর ১৮৩৬

১৮৬২ সালে 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'-র 'ভূত নাবানো' অংশটিতে আমরা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। 'হোসেন খাঁ' নামে এক প্রতারক ব্যক্তিকে ধরা পড়ে যেতে দেখা যায়—

> এদিকে রোজা খানিকক্ষণ ডাকতে ডাকতে ভূতের আসার পূর্বলক্ষণ হতে লাগলো। গোহাড়, চিল, ইট ও ছুতো হাঁড়ি বাড়ির চতুর্দ্দিকে পড়তে লাগলো, ঘরের ভেতর গুপ্ গুপ্ করে য্যান কে যাচ্চে বোধ হতে লাগলো, খানিকক্ষণ এইরকম ভূমিকার পর মড়াস্ করে একটা শব্দ হল, ভূতের বসবার জন্য ঘরের ভিতরে যে পিঁড়েখানা রাখা হয়েছিল শব্দে বোধ হল সেইখানি দুচির হয়ে ভেঙে গ্যালো—রোজা সভয়ে বলে উঠলেন—'শ্রীযুত এসেছেন।'[৮]

এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রকৃত ভূতের কথা বলেননি বা বলা ভালো ভূত বিষয়ে তাঁর সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মিলেছে অনেকটা ভূতকে অবিশ্বাস করার মধ্য দিয়েই। সাহিত্যের কালানুক্রমিক পর্যায়ে আমরা এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে পারি। ঐতিহাসিক, রোমান্সধর্মী বিভিন্ন উপন্যাস রচনার সময় বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিক বাতাবরণ, স্বপ্নদৃশ্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, অদৃষ্টের কথা বললেও একটি অংশেই প্রত্যক্ষ ভূতের কথা বলেছেন। পিশাচের কথা 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫ খ্রি.) উপন্যাসে রয়েছে। শৈবলিনী যে রাত্রে মৃত্যু অনুভব করেছিল তার মনে হয়েছিল দেহ বহন করে অন্তরীক্ষের পথে চলেছে পিশাচগণ। যদিও পরবর্তীকালে এই অংশের বহু ব্যাখ্যা হলেও সরাসারি পিশাচের অবতারণা বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসেই করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর অপ্রকাশিত একটি রচনা ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'নারায়ণ' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রচনাটির নাম ছিল 'নিশীথ রাক্ষসীর কাহিনী'। অবিশ্বাসী ছোটো ভাই সারদাকে তার দাদা নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলবে এবং ভূত দেখাবে এরকম অংশেই রচনাটি অসমাপ্ত থেকে গেছিল। প্রথম সম্পূর্ণ সমাপ্ত করেন শরচ্চন্দ্র ঘোষাল। 'ভারতী' পত্রিকায় ১৩২৪ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় তা মুদ্রিত হয়। পরে প্রমথনাথ বিশীও এটিকে পূর্ণরূপ দিয়ে 'বেতার জগৎ' শারদসংখ্যা (১৯৭৪)-য় প্রকাশ করেছিলেন।

বঙ্কিম-পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ অতিপ্রাকৃত তথা ভূতের গল্প লিখলেও তার আগে আমরা মূলধারার ভূতের গল্পের বাইরে তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত কিছু রচনা নিয়ে আলোচনা করতে পারি। বেশ কিছু প্রহসনধর্মী বা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন নিয়ে রচনা আমরা খুঁজে পাই অনেকজনের লেখায়। দীনবন্ধু মিত্রের 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ) মৃত মানুষদের কথা থাকলেও সেখানে হাসি-ই মূল আলম্বন বিভাব হয়ে উঠেছে। এছাড়াও 'পোড়া মহেশ্বর' নামে তার একটি অতিপ্রাকৃত গল্পও প্রকাশিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবী সক্রিয়ভাবে থিয়সফিক্যাল

সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও একমাত্র তার 'হুগলীর ইমামবাড়ী' (১৮৮৮) থিয়সফির প্রভাব দেখা যায়। তবে এখানে কোনো ভৌতিক অনুষঙ্গ নেই। রাজকৃষ্ণ রায়, দামোদর মুখোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ঔপন্যাসিক বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত আবহে উপন্যাস, গল্প লেখার চেষ্টা করেছেন। যেখানে স্বপ্নদর্শন, জাতিস্মরত্ব, মৃত্যুবোধের ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যায় তবে প্লট বা চরিত্র কোনোদিক দিয়েই লেখাগুলো উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বহু উপন্যাস লিখেছিলেন। প্রথম থেকেই অলৌকিক, কিছু বর্ণনা থাকলেও ক্রমে প্রেততত্ত্ব নিয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। সুরেন্দ্রমোহন রচিত 'জন্মান্তর রহস্য' (১৯০৫), 'প্রেততত্ত্ব' (১৯০৮) ও ডাকিনীবিদ্যা '(১৯১৮)' গ্রন্থ তিনটিতে প্রেত আর অলৌকিকতার সরাসরি আলোচনা দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীতে 'প্রেততর্পণ' (১৯০৭) আর 'নরকোৎসব' (১৯১৪) উপন্যাস দুটিতে তিনি কাহিনির মাধ্যমে প্রেততত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত 'অলৌকিক রহস্য' পত্রিকায় সুরেন্দ্রমোহনের 'নরকোৎসব' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হত। উপন্যাসটি প্রথমচক্র এবং দ্বিতীয়চক্র দুটি পর্যায়ে বিভক্ত। উপন্যাসের নায়ক প্রেতচক্রে আবদ্ধ। পৃথিবী এবং পৃথিবীর বাইরের জীবনের কথা, যন্ত্রণার কথা কাহিনিতে বিবৃত। তবে লেখকের পরলোক-সংক্রান্ত নিজস্ব চিন্তাভাবনা আর যুক্তি সাহিত্যগত রসাস্বাদনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। বাংলা ভাষার প্রথম ভূতের গল্প সঙ্কলন করেন সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু। তার সঙ্কলিত বইটির নাম 'ভূতের গল্প'। বইটির প্রথম সংস্করণ পাওয়া যায়নি। বইটিকে 'প্রথমভাগ' বলে উল্লেখ করা হলেও—দ্বিতীয় কোনো ভাগের সন্ধান পাওয়া যায় না। লোকবিশ্বাসে প্রচলিত মৌখিক ভূতের গল্প নিয়ে বারোটি ভূতের গল্প সঙ্কলনটিতে রয়েছে। সঠিক রচনাকাল জানা না গেলেও গোয়েন্দাগল্পের লেখক পাঁচকড়ি দে-র 'সর্বনাশিনী' নামে একটি ছোটোগল্প এই সঙ্কলনে পাওয়া যায়। যা পরবর্তীকালে সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন সম্পাদিত 'উপছায়া' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। অন্য ধরনের প্লটে এই গল্পটি বিন্যস্ত। অজ্ঞাত পরিচয় এক যুবকের পাঠানো চিঠির মধ্য দিয়ে গল্পটির চলন। অবৈধ প্রেম, মৃত্যু, পুনরায় প্রেতরূপে আগমন, ঈর্ষা—একাধিক মৃত্যু গল্পটিতে দেখতে পাওয়া যায়। তবে একমাত্র গল্প বলার ধরন ছাড়া বিশেষ কোনো ভৌতিক আবহ বা বীভৎস রসের সৃষ্টি হয়নি। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ 'অলৌকিক রহস্য' সম্পাদনা করা ছাড়াও গল্প-উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর গল্পগ্রন্থ 'বিরামকুঞ্জ'তে 'পো-দাদা' বলে একটি গল্প দেখা যায় যেখানে প্রেতদর্শনের প্রসঙ্গ আছে। গল্পটির বর্ণনকৌশলে মুনশিয়ানা দেখা যায়। যেখানে মৃত ব্যক্তি পুনরায় ফিরে আসেন।

লেখিকা কাঞ্চনমালা দেবীর প্রথম 'গল্পসঙ্কলনগুচ্ছ' (১৯১৪)তে এক ব্যক্তির দ্বিতীয় বিবাহের আগে প্রথমা পত্নীকে দর্শনের কাহিনি রয়েছে। দ্বিতীয় বিবাহ করে ফেরার পথে নৌকাডুবি হয়ে নববধূ মারা যায় কিন্তু প্রথমা স্ত্রীর আত্মা ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। কাঞ্চনমালা দেবীর 'প্রতীক্ষায়' গল্পটির তুলনায় বড়ো এবং জটিল প্লটবিন্যাসে রচিত। এক বৃদ্ধার প্রেমিকের অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকা প্রাসাদোপম এক বাড়িতে। আর প্রতি রাতেই অনেক প্রেম, দীর্ঘশ্বাস, ষড়যন্ত্রের পরিণতি-স্বরূপ ঘটে যাওয়া তার প্রেমিকের মৃত্যু দৃশ্য ফিরে ফিরে আসে। গল্পটির কথক এক ঝড়বৃষ্টির রাতে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং জ্ঞান হারান।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'বেনের মেয়ে' (১৯১৯) হিন্দুধর্ম আর বৌদ্ধধর্মের মধ্যেকার পারস্পরিক অতিপ্রাকৃত সূত্রের অন্যরকম কাহিনি। মৃৎপ্রতিমায় প্রাণের সঞ্চার, তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ থাকলেও ভৌতিক আবহ তৈরি হয়নি।

দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'উৎপীড়িতের প্রতিহিংসা' একটি রোমাঞ্চকর একই সঙ্গে ভয়ের সঞ্চার ঘটানো ছোটোগল্প। যুদ্ধক্ষেত্রে একজন সৈনিকের কাছে রহস্যজনক চিঠি বারবার আসতে থাকে এবং তারপর তার মৃত্যু হয়। এছাড়া 'গ্রহের ফের' (১৯১৭) সম্মোহনবিদ্যা-কেন্দ্রিক একটি গল্প। তবে পরলোকগত আত্মাকে নিয়ে রচিত তার একটি উপন্যাস হল 'পিশাচ পুরোহিত'। তিন হাজার বছর পূর্বের একটি মিশরীয় চরিত্রকে নিয়ে গল্পের শুরু। নরেন্দ্র নামে বর্তমানের একটি চরিত্র সেই ব্যক্তির মমি লাভ করে। অতৃপ্ত আত্মা, অতীত নিদর্শনের ছোঁয়া, পিরামিড উপন্যাসটিকে ভৌতিক আবহে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। যা সেই সময়ের সাহিত্যে সত্যিই অভিনব।

পরলোক, জন্মান্তর, আধ্যাত্মিকতা, মৃত্যু-পরবর্তী শরীর ধারণ এগুলো নিয়ে প্রথাগত গল্প রচনার থেকেও বেশি আলোচনা হয়েছে প্রেততত্ত্ব, প্রেতলোকের অস্তিত্ব এবং প্রেতলোককে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার তাগিদ। অন্তত এখন পর্যন্ত আলোচিত কাহিনির মধ্যে তো তাই প্রতিভাত। তবে বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিবাদীরা প্রথম থেকেই পরলোক বা প্রেত বিষয়ে কোনোরকম সমঝোতার পথে হাঁটতে চাননি। পাশ্চাত্যে কিন্তু বহুদিন ধরে কুসংস্কারের সামনে যুক্তিবাদকে নতজানু হয়ে থাকতে হয়েছে—উনিশ শতকে আবার নতুন করে এই তত্ত্ব আলোচনা এক ধাক্কায় আমাদের অনেকটা পিছিয়ে দেবে এ ধারণা অনেকেরই ছিল। তাছাড়াও মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরশুরামের 'বিরিঞ্চিবাবা'-র মতো অনেকেই তখন 'ভূত-ভগবান'কে নিয়ে রীতিমতো ব্যবসার চক্কর শুরু করেছিল প্রাচ্যে তো বটেই পাশ্চাত্যেও। প্রিয়মানুষকে দেখতে চেয়ে মিডিয়ামের সাহায্যে কথা বলা এতো ভীষণ মানবিক অনুভূতি। পাশ্চাত্যে যখন এই দুর্বলতা মহামারীর মতো আকার নিচ্ছে, 'মিডিয়াম'-রা

ছল-চাতুরীর মাধ্যমে একের-পর-এক মানুষের অনুভূতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে, তখন যুক্তিবাদী তথা প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা জোটবদ্ধ হয়ে প্রেততত্ত্বের ভণ্ডচর্চার বিরুদ্ধে সরব হলেন। তবুও বহুদিন ধরে চলে আসা প্রেততত্ত্বের ধারা, জাদুবিদ্যা, তন্ত্র-মন্ত্র আমাদের দেশে যেভাবে প্রচলিত তার নাম 'spiritism'। এর প্রবক্তা হলেন এক ফরাসি অ্যালান কারদেক। ভূতের নিছক গল্পের বাইরে আলোচিত বিভিন্ন সময়ের রচনায় এই 'spiritism'-ই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে।

ঠাকুরবাড়ির থিয়সফির চর্চা নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ উল্লেখ আছে একজন থিয়সফিস্ট বন্ধুর। রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা নিয়েও অজস্র গল্প আছে 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা' প্রবন্ধের লেখক অমিতাভ চৌধুরী লিখেছেন—

> প্ল্যানচেট ও মিডিয়াম প্রক্রিয়ায় পূর্ণ বিশ্বাস না রেখেই অনেকে পরলোকচর্চা করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথও কি তাই? বোধ হয় না.....রবীন্দ্রনাথ এইসব পারলৌকিক আলাপ পুরোপুরি উড়িয়ে দেন নি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝখানে থাকলেও তাঁর ঝোঁকটা যেন বিশ্বাসের দিকেই। তবে তিনি থিয়সফিস্টদের মত পরলোকতত্ত্বকে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে জড়ান নি।[৯]

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা' (১৯৪০)-য় তিনি লিখেছেন—

> বাহির মহল থেকে বাড়ির ভিতর যাবার মরু পথ ছিল খড়খড়ির আব্রু দেওয়া, উপর থেকে ঝুলত মিটমিটে আলোর লণ্ঠন। চলতুম আর মন বলত, কিসে বুঝি পিছু ধরেছে। পিঠ উঠত শিউরে। তখন ভূতপ্রেত ছিল গল্পে-গুজবে, ছিল মানুষের মনের আনাচে-কানাচে। কোন্ দাসী হঠাৎ শুনতে পেত শাঁকচুন্নির নাকী সুর, দড়াম্ করে পড়ত আছাড় খেয়ে। ঐ মেয়েভূতটা সবচেয়ে ছিল বদ্‌মেজাজি, তার লোভ ছিল মাছের 'পরে। বাড়ির পশ্চিম কোণে ঘনপাতাওয়ালা বাদাম গাছ, তারই ডালে এক পা আর অন্য পাটা তেতালার কার্নিসের 'পরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে একটা কোনো মূর্তি। তাকে দেখেছে বলবার লোক তখন বিস্তর ছিল, মেনে নেবার লোকও কম ছিল না।[১০]

রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃত রচনাগুলোর কথা আমাদের সকলেরই জানা। তবুও যেখানে সরাসরি ভৌতিক পরিবেশ বা ভূতের উপস্থিতি রয়েছে আমরা সেই গল্পগুলোর ওপর আলোকপাত করতে পারি।

ক্ষুধিত পাষাণ (১৩০২ ব.) প্রবলভাবে অতিপ্রাকৃত আবহে রচিত একটি গল্প। তৃতীয় ব্যক্তির কথনে গল্পটির নির্মাণ। সেই চরিত্রটিও কাল্পনিক। এক জীর্ণ প্রাসাদের অভ্যন্তরে বসবাসকালীন আচ্ছন্ন অনুভূতির ছোঁয়া রয়েছে এই গল্পে। ভাঙা প্রাসাদের অভ্যন্তরেই যেন শোনা যেত জলে নামার শব্দ, নূপুরের আওয়াজ, কোনো আর্তনাদ।

আতরের গন্ধ পাওয়ার পাশাপাশি আচমকা চোখে পড়ত কোনো সুন্দরীকে। এর মাঝেই মেহের আলির 'তফাত যাও সব ঝুট হ্যায়' আরও রহস্যময়তার ঘেরাটোপ বাড়িয়ে তোলে।

'ছিন্নপত্র' (১৯১২)-র এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এক প্রাসাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন—'...এই রহস্যপূর্ণ অপরিচিত সুদূর দেশে এই ঐশ্বর্যময় সৌন্দর্যময় ভয়ভীষণ বিচিত্র প্রাসাদে মানুষের হাসি কান্না, আশা-আকাঙ্খা নিয়ে কত শত সহস্র রকমের সম্ভব অসম্ভব গল্প তৈরি হচ্ছে। আমার এই সাজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা।'[১১] তাই রোমান্টিক মনও কখনো-কখনো 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর মতো অতিপ্রাকৃত পরিবেশ তৈরি করে দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' (১৩০১ ব.) সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছিলেন—'ভূত বাদ দিয়েও ভালো ভূতের গল্প লেখা যেতে পারে। কিন্তু তাতে বিশেষ ক্ষমতার দরকার। রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' এই ধরণের ভূত-ছাড়া-ভূতের গল্প।'[১২] গল্পে ভূত তো দূরে থাক অলৌকিক কোনো উপাদানও নেই, আছে শুধু প্রতিবেশ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দক্ষিণাচরণ যখনই নববিবাহিতা মনোরমার সঙ্গে নিবিড় হতে চান রাতজাগা কোনো পাখি উড়ে যেন আগের স্ত্রীর হয়েই প্রশ্ন করে 'ও কে, ও কে, ও কে গো'। এই ডাক গল্পে অনেকবার বিভিন্নভাবে ফিরে ফিরে এসেছে। দক্ষিণাচরণ রাতের অন্ধকারে অনুভব করেন কোনো ছায়ামূর্তি। আলো জ্বালতেই, ছায়ামূর্তি মিলিয়ে যায়। মশারি কাঁপিয়ে, সারা শরীর ঘামিয়ে দিয়ে হা-হা-হা-হা করে একটা হাসি যেন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। ''সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেলফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল 'ও কে, ও কে, ও কে গো। ও কে, ও কে, ও কে গো।' ''[১৩]

গল্পটি ব্যক্তিমনের জটিল মানসিকতার আলেখ্য। আধুনিক সময়ে এই মানসিকতাই আরও বেশি আলোচ্য হয়ে উঠেছে। অস্বাভাবিকভাবে মৃত প্রথমা স্ত্রীর অস্তিত্ব দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে থাকাকালীন সময়ে বারেবারেই অনুভব করেছে শশিভূষণ। পাপবোধ বা তাড়িত অতীত ভূতের গল্পের এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্রধরের কাজ করে। বর্তমান সময়ের গল্পে তো এর প্রভাব অনস্বীকার্য। 'hallucination'-এ আক্রান্ত শশিভূষণ যথার্থই অসহায়।

'মণিহারা' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছিলেন—'কোচবিহারের মহারাণিকে ভূতের গল্প শোনানো উপলক্ষে মনিহারার সৃষ্টি।'[১৪] 'মণিহারা' গল্পেও আমরা এক বিশেষ বিকারগ্রস্ত মানুষ ফণিভূষণকে দেখতে পাই। পরপর দুরাত্রি ফণিভূষণ

অলঙ্কারের আওয়াজ আর দরজায় শব্দ শুনতে পায়। সালঙ্কৃতা এক কঙ্কালকে অনুসরণ করে শীতল জলের ছোঁয়ায় তার ঘোর কেটে যায়। এই গল্পের নায়ক ফণিভূষণ একজন Somnabulist। তারপরেও গল্পটি ভূতের গল্প হয়ে ওঠার সমস্ত সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন যখন গল্পকথক নিজেই জানিয়েছেন তার স্ত্রী নৃত্যকালী আর তিনি নিজেই ফণিভূষণ।

'কঙ্কাল' গল্পটিও সার্থক ভৌতিক রসে সিঞ্চিত। ডাক্তারি ছাত্রের ঘরে পড়াশোনার প্রয়োজনীয় উপকরণ কঙ্কালটির প্রকৃত মালকিন এসে নিজের জীবনের গল্প বলে যায়। বিধবা একটি মেয়ের দুঃখযন্ত্রণার কথা মানুষের মুখ দিয়ে তখন বলানো ততটা সহজ ছিল না বলেই কি ভূতের আয়োজন? সবথেকে বড়ো কথা জীবিত অবস্থায় মেয়েটির দাদা ছিল, একটি গ্রাম ছিল—তারপরেও তার কঙ্কাল এল কীভাবে? ভূতেরা কি আসলে মানুষের কথাই বলে?

হ্যাঁ সাহিত্যের ক্ষেত্রে, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে ভূত বেশিরভাগ সময়েই মানুষের কথা বলেছে। প্রমথনাথ বিশী 'বাংলার লেখক' ১ম খণ্ডে (বিশ্বভারতী) বলেছেন—

> ...মানুষের অসঙ্গতি দেখাইতে হইলে তাহার সহিত তুল্য আবশ্যক। ভূতপ্রেতের সমাজের সহিত মানব সমাজের তুলনা অতিশয় সহজ ও বহু প্রচলিত। কাজেই তাঁকে বাধ্য হইয়া ভূতপ্রেতের সমাজের সাহায্য লইতে হইয়াছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করাই তাঁর উদ্দেশ্য, ভৌতিক গল্প বলা নয়।

ঠিক এই কাজটিই করেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। অদ্ভুত রসের মোড়কে তাঁর 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২) আসলে ভূতের অছিলায় মানুষের কথাই বলেছেন। কাহিনির দুটি ভাগ—দ্বিতীয় ভাগেই অদ্ভুত যত ঘটনা ঘটে। ভূতেদের মাধ্যমে ত্রৈলোক্যনাথ এদেশের মানুষের নকল করার প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। স্কল আর স্কেলিটন দুটি ভূত। তারা ইংরেজি নাম দিয়ে কোম্পানি খুলেছে কারণ বাংলা নাম দিলে কেউ বিশ্বাস করবে না। মাটির তলায় চাপা দিয়ে রাখা কিশোরী পরবর্তীতে দীর্ঘ নাক নিয়ে পেত্নী নাকেশ্বরী হয়ে যায়। মানুষের রক্ত পিপাসু নাকেশ্বরীর আর্বিভাব হলেই—'...তখন কঙ্কাবতী দেখিতে পাইলেন যে মৃতপ্রায় অচেতন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া খেতু বিছানায় পড়িয়া আছেন। ভীমরূপা নাকেশ্বরী পার্শ্বে দণ্ডায়মান।'[১৪] 'কঙ্কাবতী'তে লোকবিশ্বাস রয়েছে, ব্যঙ্গ রয়েছে, রূপকথাও রয়েছে। 'মধুরেণ সমাপেয়েৎ' ঘটেছে কঙ্কাবতী আর খেতুর বিবাহে।

ত্রৈলোক্যনাথের সবথেকে জনপ্রিয় এবং খ্যাতনামা ভূত চরিত্র হল 'লুল্লু' (ভূত ও মানুষ : ১৮৯৬)।

আমীর বলে দিল্লির এক বাসিন্দা স্ত্রীকে ভয় দেখানোর জন্য 'লে লুল্ল' বলেছিলেন আর ঠিক সেই সময়েই তার বাড়ির ছাদে লুল্লু নামে একটি ভূত বসেছিল, এরপর স্ত্রীর অপহরণ এবং ওঝার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের সান্নিধ্য, তাঁতির গান শুনে ভূত পালানো এবং গোঁগাঁ ভূতের মাধ্যমে তেল জোগাড় করে পত্নী উদ্ধার। প্রেততত্ত্ব নিয়ে সমকালীন হইচই, হিন্দুদের কালাপানি পেরোনো নিয়ে গোঁড়ামি, ইংরেজদের সবকিছুকেই নকল করা প্রভৃতি বিষয়কে ত্রৈলোক্যনাথ অসম্ভব ব্যঙ্গ করেছেন—

> ...ইংরেজের প্রভাবে আমাদের সকল ব্যবসাই একরূপ লোপ পাইয়াছে। অন্য ব্যবসার কথা দূরে থাকুক, ভূতদিগের ভূতে পাওয়া ব্যবসাটি পর্য্যন্ত লোপ হইয়া গিয়াছে। এই হতভাগা দেশের লোকগুলো এমন ইংরেজী ভাবাপন্ন হইয়াছে যে, কাহাকে ভূতে পাইলে কি ডাইনে খাইলে বলে কিনা হিষ্টিরিয়া হইয়াছে, একথায় রক্তমাংসের শরীরেই রাগ হয়, ভূত দেহে তো রাগ হইবেই। ...ভারতের ভূতকুল ও ডাইনিকুল আজ তাই মৌনী ও ম্রিয়মাণ। ....মরি, মরি ভারতের সকল গৌরবই একে একে লোপ হইল, এ অবস্থায় আর রোজার ব্যবসা কি করিয়া চলিবে? তাহাও একপ্রকার লোপ হইয়াছে।[১৫]

ত্রৈলোক্যনাথ সাহিত্যে ভূতের প্রয়োগ কেন করেছেন এরপর আর কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। 'ভূতের বাড়ি', 'পূজার ভূত' ভীতিময় আবহে বর্ণিত ভূতের গল্প। সেখানেও বিভিন্ন সামাজিক সংস্কার আর তার সমস্যাকে তুলে ধরেছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ।

অল্পবিস্তর বাংলাসাহিত্যে সবাই ভূতের গল্প লিখেছেন। আমাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটেই বলা হয়েছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অলৌকিকতা ছিল কিন্তু প্লটবিন্যাসে গা ছমছমে উপভোগ্য গল্প করে তোলার ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। বেশিরভাগ সময়েই দৈবশক্তির আধিক্যই গল্পগুলি জুড়ে থাকত। আধুনিক বাংলা সাহিত্য এই দৈবভাবকে দূরে সরিয়ে রেখে অনেক বেশি মানুষের গল্প বলেছে ভূতের মুখ দিয়ে। আমাদের আলোচনা একুশ শতকের ভূতকথা রচনার সম্ভাবনা, ধরন, মনস্তাত্ত্বিক অবস্থান সবকিছু নিয়েই হবে তার আগে শুধু দেখে নেব অন্যান্য ভূতের গল্পের লেখকদের। রবীন্দ্রনাথ ও ত্রৈলোক্যনাথের প্রায় সমসাময়িক যে সমস্ত লেখকেরা উল্লেখযোগ্য ভূতের গল্প লিখেছেন তাঁরা হলেন—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২), মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৮৮-১৯২৯), অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৩)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রসময়ীর রসিকতা' (১৯০৩ : গল্পাঞ্জলি) ভূত ছাড়া একটি ভূতের গল্প। রহস্যময়তা আর গল্পসজ্জার কারণে গল্পটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

'বৈদ্যুতিক হিন্দু সভা'-র একটি অধিবেশনে একটি ভয়ানক রসের ভূতের গল্প পাঠ করা হয় 'একটি ভৌতিক কাণ্ড' নামে রচনার চতুর্দশ পরিচ্ছেদে।

মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়ও অতিপ্রাকৃত রচনার পাশাপাশি 'ভূতুড়ে কাণ্ড' (১৯০৮) রচনা করেছিলেন। 'কঙ্কালের উদ্ধার' তার লেখা জনপ্রিয় ভূতের গল্প।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'ভূতপতরীর দেশ' (১৯১৫) আর-'হানাবাড়ির কারখানা'য় (১৯৬৩) সরাসরি ভূতের প্রসঙ্গ এনেছেন। চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ভূতের গল্পেও সাজিয়েছেন বিভিন্ন রং। পালকিবাহক ভূতেরা গান ধরে বেখাপ্পা সুরে। কেবল হাড় খটখট আর দাঁত কিটমিট। ঘুমিয়ে থাকতে থাকতেও গল্পকথক শুনতে পান—

চলে চলে
হুমকি তালে
পঙ্খী গালে
মাসিপিসি
বাঘ বেরোলে।

ভূত পেরেতে
চলেছে রেতে
হনহনিয়ে
ভূতপেরেতে।

প্রমথ চৌধুরী প্রবন্ধ রচনার পাশাপাশি প্রেমকেন্দ্রিক, লোকসংস্কার ভিত্তিক, হানাবাড়ি নিয়ে এবং কৌতুক রসে সমৃদ্ধ বেশ কয়েকটি অতিপ্রাকৃত ও ভূতের গল্প লিখেছিলেন।

বিংশ শতাব্দীতে আমরা বাংলা সাহিত্যে অজস্র লেখককে দেখতে পাই যারা অলৌকিক তথা ভূতের গল্প লিখতে শুরু করে। বিংশ শতাব্দী সেই সময় যখন ভূত সম্পর্কে মৃত মানুষের মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা স্পষ্ট। যেখানে এককথায় ভূত 'individual' হয়ে উঠল। এর আগে অনেক গল্পেই 'ভূতের' ইতিহাসে মনুষ্য জীবন দেখানো হয়নি। বিংশ শতাব্দীর পর ভূতের দলবেঁধে থাকা বা রূপকথার রাক্ষস-খোক্কসদের দিন একেবারেই ফুরিয়ে এল। এই সময় শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, পরশুরাম (রাজশেখর বসু), শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়), প্রমথনাথ বিশী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় দুজনের কথাই অতিপ্রাকৃত গল্পের ক্ষেত্রে বলতে হয়। তবে একেবারে ভূতের গল্প রচয়িতা হিসাবে

পরশুরাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজশেখর বসু থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র অর্থাৎ (১৮৮০ থেকে ১৯৮৮) এই সময়কালে বাংলা সাহিত্যে যে ভূতের গল্প রচিত হয়েছে উনিশ শতকের সঙ্গে তার প্রধান পার্থক্যই হল আধ্যাত্মিকতা, দৈবশক্তির প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণভাবে ভৌতিক রসকে উপভোগ্য করে তুলে সার্থক ভূতের গল্প তৈরি করা। ভূতের কেন গল্পই হয় সেই অর্থে উপন্যাস তৈরি হয় না তা বোঝার জন্য সবথেকে ভালো সময় হল এই বিংশ শতাব্দীই। যদিও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অনেক উপন্যাসেই আমরা ভূতকে দেখতে পাই কিন্তু তারা সবাই গল্পের মূলকেন্দ্র থেকে সরে উপগ্রহের মতো থাকে—সার্থক ভূতের উপন্যাস না হওয়ার কারণ হয়তো একমাত্র রস নিষ্পত্তিই। কিছু আছে এবং আমরা তার জন্য অপেক্ষা করছি—এই অপেক্ষার অস্বস্তিটাই ভূতের গল্পের নিউক্লিয়াস। ভয়ানক এমন একটা রস যা প্রত্যক্ষ হওয়ার পর আর কোনো ঊর্ধ্বগামী ধাপ থাকে না। অর্থাৎ শরদিন্দুর 'আকাশবাণী' বা 'পিছু পিছু চলে', 'কালো মোরগ' বা সত্যজিৎ রায়ের 'অনাথবাবুর ভয়', 'ধূমলগড়ের হান্টিং লজ', 'বাদুড় বিভীষিকা', 'গগন চৌধুরীর স্টুডিও' সব কটি গল্পে তীব্র 'Tension' তৈরি হয়েছে, তারপর গল্প Climax-এ পৌঁছেছে। রাজশেখর বসু-র 'ভূষণ্ডীর মাঠে' এরকম কোনো Tension কিন্তু তৈরি হয়নি। ভূত যেখানে 'Metaphor' বা কোনো সামাজিক বার্তা দেয় সেখানে ভৌতিকতার থেকেও গল্পের বক্তব্যকে বেশি জোরালো হতে হয় তুলনায় উপভোগ্য বেশি হয়ে ওঠে যে গল্পে জমাট প্লট আর কৌতূহল আর অপেক্ষার পর সর্বোচ্চ চমক অবস্থান করে। আধুনিক সময়ে প্রযুক্তির ব্যবহার অন্যান্য সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে ভৌতিক সাহিত্যেও অনেক পরিবর্তন এনেছে। তবে ভূতের গল্পের মূল সূত্রগুলি আলোচনা করে নিয়ে আমরা একুশ শতকের ভূতকথা রচনা সম্ভাবনার দিকে এগোব। আমাদের প্রত্যেকেরই খানিকক্ষণ পরের সময়টুকুই অনিশ্চিত। কেউই জানি না কাল কি হবে। এই অনিশ্চয়তা থেকে ভয়, ভয় থেকে কৌতূহল, কৌতূহল থেকে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা থেকে প্রয়োগ, প্রয়োগ থেকে পরিণামে পৌঁছানো মানবসভ্যতার ধারাবাহিক গতিপথ। আমরা আগেই আলোচনা করেছি অতিপ্রাকৃত গল্প, ভূতের গল্পে পরিবেশ তথা বাতাবরণের ভূমিকা। লেখকের দক্ষতা, গল্প কথকের উপস্থাপন ক্ষমতার ওপরেই নির্ভর করে বাতাবরণ সৃষ্টির শব্দপ্রযুক্তি এবং প্রকল্প।

পরিবেশ নির্ভর হওয়ার জন্য ভূতের গল্পকে অবশ্যই টানটান হতে হয়। এখানে স্লথগতি, প্লটবিন্যাস কিংবা অ্যান্টি স্টোরির কোনো জায়গা নেই। লেখকের Narrative-এর দক্ষতায় পাঠককে নিয়ে যাওয়া হয় রসাস্বাদনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এই

তীব্রগতি রকেটপ্লটের মূল হল 'Tension of Suspense and Surprise।' এই 'Tension'-এর মূল কথাই হল একধরনের বিপরীতমুখীনতা। এই বিপরীতমুখীনতা যখন মুখোমুখি হয় তখন ভূতের গল্পের প্রকৃত সার্থকতা। ভূতের গল্পে থাকে রকেট গতিপ্লট। ছোটোগল্পের স্বাভাবিক নিয়ম 'Single Sitting'-এ শেষ করার মতোই। আর ভূতের গল্পের 'Texture'-এর বুনোন হয় ধাপে ধাপে। সবথেকে গল্পের জরুরি সময় হয়ে ওঠে 'Key moment'। যার বাংলা বলা যায় 'উদ্ভাসিত ক্ষণ'। এই 'Key moment' থ্রিলার গল্পেও থাকে। কিন্তু তার মূলে থাকে Reality। ভূতের গল্পে উদ্ভাসিতক্ষণ তো বটেই ক্লাইম্যাক্সের পরেও থেকে যায় Illusion। তাই ভূতের গল্পের উদ্ভাসিতক্ষণ রহস্য উন্মোচনে নয় বরং রহস্যঘেরা জগতের প্রবেশপথ। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের বহুল পঠিত 'কে'? গল্পটির কথা আমরা এ প্রসঙ্গে ব্যবহার করতে পারি। উড়িষ্যার এক ডাক-বাংলোর এক রাত্রির ঘটনা গল্পটিতে রয়েছে। 'উদ্ভাসিতক্ষণে' অন্ধকার রাত্রিতে 'একটা ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে দরজা ঠেলে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলে একটি স্ত্রী মূর্তি। তাকে ভালো করে দেখবার আগেই বাতাসের ঝাপটে আলোটা নিভে গেল।' এরপর সেই মহিলা রাত্তিরে যখন বাঘের রূপ ধরে বসে থাকে তখন বন্দুক নিয়ে গুলি চালানো আর বাঘের গলা থেকে মহিলার আর্তনাদ গল্পটির 'Climax' সূচিত করে। বিস্ময় আর জিজ্ঞাসায় গল্প শেষ হয়—'রূপলাল, আজ রাত্রে যে স্ত্রীলোকটা এখানে এসেছিল সে কে? গুলি করলুম বাঘকে, চিৎকার করলে একটা স্ত্রীলোক। এর মানে কী? সে কে? সে কে?'

ভূতের গল্পে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল টেনশনের মাধ্যমে 'অসম্ভব'কে সম্ভব করে তোলা। একই সঙ্গে অনেকগুলি প্রজন্ম, অনেকগুলো শতাব্দীর মানুষও ভূত হয়ে এক জায়গায় চলে আসতে পারে। নীলকর সাহেব থেকে সাম্প্রতিক চটকল বন্ধ হয়ে যাওয়া শ্রমিক, এই অবাধ যাওয়া-আসা ভূতের গল্প ছাড়া আর কোনো গল্পে পরিলক্ষিত হয় না। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ভূতুড়ে ঘড়ি' উপন্যাসে বলেছেন—

> ভূতেদের নিয়ম হল তারা দিনের বেলা ঘুমোয়, রাতের বেলা জাগে। এ ব্যাপারে প্যাঁচা বা বাদুড়ের সঙ্গে তাদের বেশ মিল আছে। অনেকেই বলে থাকে যে, ভূত মাছ-ভাজা খেতে ভালোবাসে। কিন্তু সর্বশেষ গবেষণায় জানা গেছে, ভূতেরা আসলে কোনো কঠিন বা তরল খাদ্য খেতে পারে না। তারা খায় বায়বীয় খাবার। যেমন বাতাস, গন্ধ, আলো, অন্ধকার ইত্যাদি।

সাধারণ গল্পের সঙ্গে ভূতের গল্পের পার্থক্য এখানেই। সাধারণ গল্পে বাস্তবকেই উপস্থাপিত করতে হয় কিন্তু ভূতের গল্পে এই কৌশল আরও কঠিন। যেখানে অবাস্তবকে সম্ভব এবং স্বাভাবিক করে উপস্থাপিত করতে হয়, পরাবাস্তবের অস্পষ্ট

জগৎকে উজ্জ্বল করে তুলতে হয় পাঠকের মাধ্যমেই। গল্পের মধ্যে কখনো লেখক নিজে উত্তমপুরুষে কিংবা কোনো কথকের মাধ্যমে গল্পটিকে বলে থাকেন।

একুশ শতক তথ্যপ্রযুক্তি আর ছোটো হয়ে আসা পৃথিবীর শতাব্দী। এক মিনিটের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা মানুষ একত্রিত হতে পারে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটের মাধ্যমে। অন্ধকার রেলস্টেশন, পোড়া বটতলা, বাঁশবাগান—এসবই আস্তে আস্তে শুধু বইয়ের পাতায় থাকছে। যৌথপরিবার ভেঙে ছোট্ট ছোট্ট পরিবার ফ্ল্যাট-বাসিন্দা। আলো ঝলমলে নগর সভ্যতায় একটু অন্ধকার পাওয়ার জন্য হা-পিত্যেশ করতে হয়—সেখানেও প্রতি পত্রিকাই ভূত সংখ্যা বের করে। হু-হু করে বিক্রি হয় নতুন নতুন ভূতের গল্পের সঙ্কলন। সময়ের চাহিদাতেই বদলে গেছে ভূতের গল্প, ভূতেদের মানসিকতা। সবথেকে বড়ো বদল এসেছে হয়তো ভূতেদের ভাষাতেই। আমরা জানি নাসিক্যধ্বনির প্রাবল্য ভূতেদের চিহ্নিত করার জন্য সবথেকে সহজ উপায়। সে বিদেশি রাক্ষসদের 'Fie Fi Foe' হোক বা এখানকার রাক্ষসদের 'হাঁউ মাঁউ খাঁউ'। হয়তো মৃত্যু-পরবর্তী স্বরযন্ত্রের বৈকল্যের কারণেই ধ্বনির এরকম বিকার। আবার ভূতের গল্পর শুরু যেহেতু মৌখিক পরম্পরার মাধ্যমে তাই অনেকেই মনে করেন নাটকীয় ভঙ্গিমায় ভূতকে অবতারণা করানোর জন্য নাসিক্যধ্বনির প্রয়োগ ঘটানো হত। যাই হোক, এই শতাব্দীর অধিকাংশ ভূতের গল্পেই ভূতকথার ওপর আর চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করে না। সাম্প্রতিক আগস্ট মাস ২০১৫, 'কিশোর ভারতী' পত্রিকা আয়োজিত অশরীরী গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প 'ব্রহ্মকমল' (পিয়ালী দে সরকার) গাইড মানুষ বা ভূত দুই অবস্থানেই একই ভাষায় কথা বলে। এই ধারাটাই কিন্তু দেশ বা বিদেশের গল্পে ছিল না। *খসখস করে আওয়াজ*—'ঘরের মধ্যে কে *খস্ খস্* করে চলে বেড়াচ্ছে'। ('বহুরূপী' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।)

খোনা গলা—

'কেঁ র‍্যাঁ? খোনা গলা শুনে পাঁচুর সংবিৎ ফিরল।'

('বেঁচে গেল পাঁচুগোপাল'—শিবশঙ্কর দাস।)

অস্পষ্ট আওয়াজ

'ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে পেলুম।'

('পাগলা সাহেবের কবর'—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।)

এই সময়কালে প্রযুক্তির সঙ্গে তাল রেখেই তাই ভূতেরাও হয়তো 'Break The Language Barrier'-এর সওয়াল করেছে। 'ভূতের ভবিষ্যৎ'-এ ভূতেরা ফেসবুকের মত 'স্পুকপুক'-এর কথা বলেছে। বলিউডি ভূতের সিনেমার নাম হয়েছে MMS-এর

নামে। মোবাইল ব্যবহার করে ভূত আধুনিক সময়ের অনেক গল্পেই। সিজার বাগচীর সাম্প্রতিক গল্প 'নিশির ডাক'-এ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কয়েকজন প্রোমোটারকে এক মহিলার আত্মা কোনো অজানা নম্বর থেকে ফোন করত যা আর পরে কললিস্টে থাকত না।

অনিন্দিতা গোস্বামীর 'ল্যাপটপ' গল্পে পারস্পরিক বিশ্বাসহীনতা আর অবক্ষয়ের যন্ত্রণাকে টেকনোলজির মাধ্যমে ফুটে উঠতে দেখি। তুতান বলে একটি ছেলে ল্যাপটপ ব্যবহার করার সময় সেখানে 'গিভ মি সাম ব্লাড, লেট মি লিভ' ফুটে উঠতে দেখে। ল্যাপটপ ব্যবহারকারী এর আগে যে ব্যক্তি ছিলেন তিনি ষড়যন্ত্রে খুন হন। তার জীবনের গল্প তিনি এই ল্যাপটপেই বলে যান।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভূত নিয়ে চর্চা করা লেখকদের মধ্যে পুরোধা হলেন প্রচেত গুপ্ত। তিনি বারেবারেই বলেছেন ভূত মানে অতীত, এটা মানি না। তার বক্তব্য বিজ্ঞান যদি নিজেকে বদলাতে পারে বাংলা ভাষার অর্থকেও জগদ্দল পাথরের মতো আটকে থাকতে হবে কেন? তার 'রাতে পড়বেন না' (মিত্র ও ঘোষ, ২০১৪) রচিত গল্পগুলিতে কোথাও আসলে আমাদের মনের অন্তঃস্থলে থেকে যাওয়া ভয় আর যা জানতে বা দেখতে ভয় পাই তা দেখে ফেলা থেকেই ভূতের জন্ম—একথাই বারবার ফিরে এসেছে। 'একদিন যদি দরজায় কড়ানাড়ার শব্দ শুনে দরজা খুলে দেখি আমি নিজেই দাঁড়িয়ে আছি।' 'দেখা জিনিসের বাইরে নতুন জিনিস দেখা। বিস্ময়' বলেছিলেন লেখক। একথা শীর্ষেন্দুও বলেন 'বইয়ের দেশ' (এপ্রিল-জুন ২০০৮)-এ 'ভয় দেখানো ভূত নিয়ে লিখতে ইচ্ছে হল না। ভূত আমার কাছে সুপারহিরো চরিত্র। সাধারণ মানুষ যা করতে পারে না, ভূত তাই করে। ভূত মজাও করে। বাচ্চারা এটা পছন্দ করেছে খুব।' ভালো ভূতেরা উপেন্দ্রকিশোর, লীলা মজুমদার বা রূপকথার 'জোলা ও সাতভূতে'ও এসেছিল। 'খারাপ' ভূতেরা তথাকথিত ভাবে নিজের অতৃপ্ত বাসনা পূরণ আর অন্যের ক্ষতিসাধন করেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে। 'লুল্লু'-র মতো ভূতরা যারা প্রচলিত ভণ্ডামি আর সমাজনির্মিত মুখোশ ছিঁড়ে দেওয়ার কথা বলেছে সেই গল্পের একটা ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হয়েছে। ভালো-খারাপ-রোগা-মোটা-অভিজাত-নিম্নবর্গীয়-অসহায়-দাপুটে ভূতের রাজত্বেও মানুষের মতোই অজস্র বিভাজন, বৈষম্য। যতদিন মানুষ অসহিষ্ণুতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে থাকবে নানান শ্রেণির, ধর্মের, বর্ণের ভূতেরাও সাহিত্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে নিজেদের দল ভারী করে তুলবে। কাউন্সেলরের চেম্বারে কেসস্টাডি হয়ে ফিরে ফিরে আসা ভূত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবে আমাদের মনের অসুখ। সাহিত্যের ভূতেরা বাড়ুক—সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গাছ না পেলে হাইরাইসিং ফ্ল্যাটবাড়িতে খুলে থাকুক। আমরা আয়নার

সামনে দাঁড়িয়েও যদি মানুষ বলে নিজেকে চিনতে দ্বিধাগ্রস্ত হই তাহলে অন্তত পিছন ফিরে দেখি কেউ আমাদের দেখছে।

উদ্ধৃতি সূত্র

১। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অন্য ভুবন', বর্তিক ১ম প্রকাশ, ১৩৫৯ ব. (১৯৬২), ভূমিকা।

২। সুকুমার সেন 'গল্পের ভূত', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম সংস্করণ ১৯৮২, অধ্যায়—ভূতের গল্প।

৩। Edward Charles Whitmore, 'The Supernatural in Tragedy', Harvard University press, 1915, Introduction.

৪। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'অন্য ভুবন' বর্তিক ১ম প্রকাশ, ১৩৫৯ ব. (১৯৬২), ভূমিকা।

৫। শিবনাথ শাস্ত্রী—'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' ১ম প্রকাশ ১৯০২, ৩য় সংস্করণ নিউ এজ পাবলিশার্স, পৃ. ৩৩২।

৬। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ৪র্থ সংস্করণ, সংশোধিত ৫ম সংস্করণ, ১৩৬২ পৃ. ১৮৭।

৭। সুকুমার সেন 'ভূতের গল্প : দেশে' ভূমিকা, সুকুমার সেন ও সুভদ্রকুমার সেন সম্পাদিত উপছায়া, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬৪ পৃ. ২২।

৮। সজনীকান্ত দাস ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' ১ম ভাগ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৫ বঃ, পৃ. ৭৮।

৯। অমিতাভ চৌধুরী, 'একত্রে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ 'রবীন্দ্রনাথের পরলোকচর্চা', অধ্যায় ২, দে'জ পাবলিশিং, ১ম প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ. ১৩।

১০। রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা' বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১ম প্রকাশ ১৩৪৭ ব., পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৮ ব. পৃ. ১৩।

১১। রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্র' বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ১ম বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩১৯ ব. নূতন সংস্করণ ১৩৮২ বঃ, পত্রসংখ্যা ১১৯, সাহাজাদপুর, ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ২৩৮।

১২। সুকুমার সেন, 'গল্পের ভূত', আনন্দ পাবলিশার্স, ১ম প্রকাশ ১৯৮২, অধ্যায় 'ভূতের গল্প' পৃ. ৪৫।

১৩। রবীন্দ্রনাথ, 'গল্পগুচ্ছ', বিশ্বভারতী সংস্করণ, ১৩৩৩, 'নিশীথে'।

১৪। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 'কঙ্কাবতী', বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত নূতন সংস্করণ, ১৩৪৪ ব., পুনর্মুদ্রণ ১৩৬৭ ব., ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি।

১৫। 'ত্রৈলোক্য রচনাসমগ্র' ২য় খণ্ড। সম্পাদনা ড. সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা, গ্রন্থমেলা, ১৯৭৪।

আকর গ্রন্থ

১। অদ্রীশ বর্ধন (সম্পা) 'ভৌতিক অমনিবাস' ১৯৮৫, গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা।

২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'অবনীন্দ্র রচনাবলী', ৩ খণ্ড (১৯৭৪, ১৯৭৪, ১৯৭৬), প্রকাশভবন, কলকাতা।

৩। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'উপেন্দ্রকিশোর রচনাবলী', ১৯৯০, তুলিকলম, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা।
৪। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ত্রৈলোক্যনাথ গ্রন্থাবলী' ১ম ও ২য় খণ্ড, বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড।
৫। দিলীপকুমার মিত্র, 'বিদেশী অলৌকিক কাহিনি', ১৯৮২, নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাতা।
৬। পৌলমী সেনগুপ্ত (সম্পা:), 'আনন্দমেলা ভূতের গল্প সঙ্কলন', ২০১১, প্রথম সংস্করণ, আনন্দ পাবলিশার্স।
৭। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, 'কল্পকথা', ১৯০৯, 'ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প', অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, 'ভূতুড়ে কাণ্ড', ১৯০৮, ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।
৮। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শরদিন্দু অমনিবাস' (৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৯। 'কিশোর উপন্যাস সমগ্র' শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রথম-চতুর্থ খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স (২০১১-১২)।
১০। 'হেমেন্দ্রকুমার রায় রচনাবলী' ১ম-৫ম খণ্ড, ১৯৮৩, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি।